

সালাফদের থেকে আমরা কতদূরে?

শাকির মাহমুদ সাফাত



পেন্টাফ্রিম

পাবলিকেশন



সম্পাদকের কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ. أَمَّا بَعْدُ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের। যিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ঈমান ও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছেন। দুরূদ ও সালাম খতামুন-নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে মানবসভ্যতার আলোকবর্তিকা রূপে গড়ে তুলেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্মকে।

রসূলে কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে কিয়ামাতের দিকে সময় যত এগিয়েছে, মানুষের ঈমান-আমলের দুর্বলতা তত প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছে। এমনটা হবে—নবীজি জানতেন। এজন্য পরবর্তী যুগ-যুগান্তরে আদর্শ রূপে তিনি নিজ তারবিয়াতে গড়ে দিয়ে গেছেন সাহাবি-প্রজন্ম। পাশাপাশি গোমরাহির সয়লাবে ভেসে-যাওয়া সময়ে মানুষ হিদায়াতের পথ লাভ করবে কীভাবে—সে আলোকবর্তিকাও বাতলে দিয়ে গেছেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى
إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عِلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ
بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

“বানি ইসরাইলের মাঝে যতগুলো ফিতনা এসেছে, অবিকল

তার সবগুলো আমার উম্মাতের মাঝেও আসবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে মায়ের সাথে যিনা করে থাকে, তাহলে আমার উম্মাতের মাঝেও এমন লোক আসবে, যে এই ঘৃণিত কাজ করবে। বানি ইসরায়েল বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর দলে; আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে। একটি দল ছাড়া সবগুলো দল জাহান্নামে যাবে।”

“তারা কারা হবে, ইয়া রসূলাল্লাহ?” উৎসুক সাহাবিগণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, “মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি—যে পথে চলেছি আমি ও আমার সাহাবিগণ।”^৫

এই ‘মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি’র আদর্শকে যথাযথভাবে যারা ধারণ করেছেন, তাদেরকে বলা হয় ‘খইরুল কুরুন’ বা শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও নির্দিষ্ট করে তাদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلَوْهُمْ

“তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আমার প্রজন্ম, এরপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম; এরপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম।”^৬

অর্থাৎ, খাইরুল কুরুন হলো সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবৈ-তাবিয়ি—এই তিন প্রজন্ম। পরবর্তী সকল প্রজন্মের উন্নতি-অগ্রগতি ও পরকালীন মুক্তি—সবকিছু নিহিত আছে এই তিন প্রজন্মের নমুনা ও আদর্শের মাঝে। এই তিন প্রজন্মকেই বলা হয় সালাফে সালিহিন। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের ঈমান-আমল যেমন দুর্বল হয়েছে, তেমনই দূরত্ব তৈরি হয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের সাথে।

কেমন ছিল সালাফদের ঈমান-আমল? কেমন ছিল তাদের আখলাক-চরিত্র? কেনই-বা তারা শ্রেষ্ঠ প্রজন্মের তারকাতুল্য? কাল পরিক্রমায় সালাফদের থেকে আমরা কতটা দূরে? কী আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের বাস্তবতা? সালাফদের থেকে এই দূরত্ব কীভাবে ঘুচাতে পারি আমরা? লেখক শাকির মাহমুদ সাফাত বক্ষ্যমাণ বইয়ে এ প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস,

[৫] সুনানুত তিরমিযী : ২৬৪১।

[৬] সহিহুল বুখারী : ২৬৫১।



জীবনী-সহ বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র-সহ সালাফদের জীবনের আকর্ষণীয় ও অনুসরণীয় ঘটনাবলির পদরেখা ধরে লেখক তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে ধীরস্থিরভাবে এগিয়েছেন। ঘটনার পাশাপাশি তুলে ধরেছেন তাফাকুর ও তাদাবুর। ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঘটনাবলির সমর্থন ও বিশ্লেষণ। লেখক বারবার দেখাতে চেয়েছেন সালাফদের থেকে আমাদের দূরত্ব। বারবার করাঘাত করতে চেয়েছেন আমাদের বোধের বন্ধ দুয়ারে।

সালাফদের নিয়ে অতীতে বাংলায় বেশকিছু অসাধারণ কাজ হয়েছে। ভবিষ্যতে নানা আঙ্গিকে আরও কাজ হওয়া প্রয়োজন। মুবারক এই সিলসিলায় বক্ষ্যমাণ বইটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই বই আমাদের বিবেকের বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।

শাকির মাহমুদ সাফাতের ভাষাশৈলী প্রাজ্ঞ। ফলে, সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমাকে বেগ পেতে হয়নি। যেহেতু লেখক নিজেই একজন পেশাদার সম্পাদক, তাই সিকি বা আধা-বইকে মানুষ করবার মতো ঝঙ্কি আমাকে পোহাতে হয়নি। বরং, বইকে উন্নততর করতে কিছু প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন, মূল উৎস-গ্রন্থাবলির হাওয়ালা যাচাই ও সংশোধন—সম্পাদক হিসেবে এরচে’ বেশি কিছু আমাকে করতে হয়নি। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। তাই, ভাষা, বানান অথবা বিষয়গত কোনো ত্রুটি কারও নজরে এলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। যথাযথ হলে নির্দিধায় আমরা শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা যেন বইয়ের লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সালাফে সালিহিনের যথাযথ অনুসরণকারী বানিয়ে দেন—এই দুআ করি।

~মাহমুদ সিদ্দিকী

আলিম | লেখক | সম্পাদক





সুচিপত্র

বিশ্বাসী হৃদয়ের দিনযাপনের রূপরেখা.....	১৭
হিদায়াত : সফলতার সূচনা অথবা আত্মপ্রবঞ্চনা.....	১৯
যশ-খ্যাতির মোহ সালাফদের পথ নয়.....	২৫
প্রাচুর্য নয়, তারা বেছে নিয়েছিলেন সাদাসিধে জীবন.....	৩২
যে-ঈমান ও তাওয়াক্কুল শত বিপদেও অটুট.....	৩৯
সকল কাজের লক্ষ্য শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি.....	৫০
প্রিয় বস্তু থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয়.....	৫৪
দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের স্মরণিকা.....	৫৯
অন্তরের পরিশুদ্ধিই প্রকৃত সফলতা.....	৬৩
সলাতের হুক.....	৬৮
জামাআতে সলাতের গুরুত্ব.....	৭১
বিনয়ের পরিচয়.....	৮০
দুনিয়াবিমুখ শাহজাদি.....	৮২
আখিরাতের স্মরণে কান্না.....	৮৫
সালাফদের জাহান্নামভীতি.....	৮৯
সময়ের গুরুত্ব.....	৯২
শীর্ণকায় লোকদের জন্য সুসংবাদ.....	৯৭
মৃত্যুকে স্মরণ : সহজ জীবনের চাবিকাঠি.....	১০২
আল-ফিকহুল আকবার : সন্তুষ্ট জীবনের চাবিকাঠি.....	১০৪
নিজের কাজ নিজে করা.....	১০৫
কুরআন শ্রবণে মুমিনের ক্রন্দন.....	১০৮



ইলম অর্জনে বয়স কি কোনো বাধা?	১১২
সবাইকেই একদিন তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে.....	১১৫
আদর্শ স্ত্রী : স্ত্রীদের জন্য স্মরণিকা	১১৭
স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য জায়েয নেই.....	১২১
পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তম আদর্শ	১২৪
শাসকদের দরবারে যাওয়ার ক্ষেত্রে স্মরণিকা	১২৭
শাসকের অনুদান থেকে বিমুখতা	১২৮
প্রকৃত মুত্তাকি ও যিকিরকারী	১৩১
মতামত প্রদানে সালাফদের আদর্শ.....	১৩২
ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য	১৩৪
ইলম অর্জনের আদব	১৩৭
নাসিহাতের ভাষা	১৪৩
রাতজাগা ইবাদাত : সালাফদের অভ্যাস.....	১৪৬
শীতকাল : মুমিনের বসন্ত	১৪৯
নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমাত সৎকর্মশীলদেরই নিকটবর্তী.....	১৫৩
ইলমের অমর্যাদায় ইলমচর্চাকারীরা দুনিয়ামুখী হয়ে যায়	১৫৭
ক্ষমা মহৎ গুণ.....	১৬১
দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়া নিরেট বোকামি	১৬৪



সৌভাগ্যবান ছিলেন তিনি। কত সাফল্যমণ্ডিত ছিল তার দ্বীনি ক্যারিয়ার। অথচ, এ সাফল্য ও সৌভাগ্যের মূল যে হিদায়াত, তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি তার ভাগ্যে। সন্ত্রীক আবিসিনিয়ায় হিজরতের কিছুদিন পরই তিনি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। আর খ্রিষ্টান অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।^{১৭}

বালআম ইবনু বাউরা ও উবাইদুল্লাহ ইবনু জাহশের এ ঘটনাদ্বয়ে নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যাতে আমাদেরকে জানিয়ে দেন—এত জ্ঞানী, সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান একজন মানুষও কীভাবে জৈবিক কামনা-বাসনা ও দুনিয়াবি স্বার্থের মোহে পড়ে, হিদায়াতের পর পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছিল।

এ-কারণেই সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে সালাফে সালিহিনের সবার জীবনীতেই একটি কমন চিত্র আমরা দেখতে পাই। ঈমান ও হিদায়াতকে তারা গ্যারান্টিড মনে করতেন না। আখিরাতের ভয়ে যেমন তারা তটস্থ থাকতেন, সেইসাথে ঈমানের ওপর যাতে মৃত্যু হয়, হিদায়াতের ওপর যেন আমৃত্যু অটল থাকা যায়, সে-ব্যাপারেও থাকতেন সতর্ক। এমনকি আবু বকর, উমার রদিয়াল্লাহু আনহুমা মতো জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবিরাও দুনিয়াতে হিদায়াত, ঈমান ও আখিরাতে জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে থাকতেন না। যেমন—আবু বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু র ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন “আমি যদি (প্রকৃত) ঈমানদারের একটি পশমও হতাম, তবে তা আমার কাছে অধিক প্রিয় হতো।” তিনি আরও বলতেন, “আল্লাহর কসম! আমি যদি কোনো গাছ হতাম, আর আমাকে কেটে ফেলা হতো, আমি কেটে যেতাম (এর মাধ্যমেই আমার পরিসমাপ্তি হতো। আখিরাতে হিসেবের সম্মুখীন হওয়ার কোনো বিষয় থাকত না)—এটাই আমার জন্য প্রিয় ছিল।”^{১৮}

একবার এক বাগানে তিনি ঢুকে দেখলেন, গাছের ডালে একটি পাখি বসে আছে। গাছের ছায়ায় পাখিটিকে দেখে তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “হে

[১৭] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ (সীরাতু ইবনি হিশাম) : ১/২২৩ ; আল-মিযবী, তাহযিবুল কামাল : ৩৫/১৭৫।

[১৮] জালালুদ্দীন সুয়ুতী, তারিখুল খুলাফা : ১/৮৬।

পাখি, তুমি বড়োই ভাগ্যবান। গাছের ফল খাচ্ছ, গাছের ছায়ায় থাকছো, অথচ আখিরাতে তোমার কোনো হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে না। হায়! আবু বকর যদি তোমার মতো হতো!”^{১৯}

একটু চিন্তা করুন, সর্বাত্মে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ব্যক্তি, বারংবার জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া মানুষটিও নিজের ঈমান নিয়ে নিশ্চিত-নিশ্চিত থাকতেন না। আখিরাতে হিসেবের সম্মুখীন হওয়া নিয়ে পেরেশান থাকতেন সর্বদা। উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারেও কাছাকাছি বর্ণনা পাওয়া যায়। অথচ আমাদের ক্যালকুলেশন অনুযায়ী তাদের তো দুনিয়াতে ঈমান-হিদায়াত ও আখিরাতে জান্নাতের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু না, সালাফে সালিহিনের চিন্তাচেতনাই ছিল এমন যে, ‘হিদায়াতের ওপর অটল থেকে, ঈমানের সহিত মৃত্যুর আগপর্যন্ত নিজেদের ব্যাপারে এত নিশ্চিত তো দূরের কথা সুধারণাও রাখা যাবে না।’ অথচ, আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েও, ঈমান ও হিদায়াতের জন্য তেমন কোনো ত্যাগ স্বীকার না করেও, আমরা একে গ্যারান্টিড মনে করে বসে আছি।

দ্বীন নিয়ে চিন্তা ও বোধে সালাফদের সাথে এ দূরত্ব যদি আমাদের বুঝে আসে, তবে আমরা যেন কখনো এ আত্মপ্রবঞ্চনায় না ভুগি যে, আমরা ঈমান ও হিদায়াত পেয়ে চূড়ান্ত সফলতা পেয়ে গেছি। আমাদের জান্নাত তো সুনিশ্চিত! হিদায়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করে, বিচার দিবসে জান্নাতের ফয়সালা হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা কেউই চূড়ান্ত সফল নই। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত নই। তাই আমরা যারা ঈমান এনেছি, আমাদের প্রত্যেকের উচিত আল্লাহর কাছে দুআ করা, যেন আমৃত্যু এ দ্বীনের ওপর অটল থাকতে পারি। হিদায়াতের পথে অবিচল থাকতে পারি। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআলাও পছন্দ করেন, যেন ঈমানদার বান্দারা তার নিকট এই দুআ করে। এজন্য পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেই আমাদেরকে দুআ শিখিয়েছেন হিদায়াত প্রার্থনা করা এবং হিদায়াতের ওপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপারে। কুরআনের প্রারম্ভিকা, সূরাতুল ফাতিহা—যা আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত

[১৯] প্রাগুক্ত।



“তিনি তো সেই সত্তা—যিনি রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী বানিয়েছেন। এতে উপদেশ রয়েছে তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় কিংবা যারা কৃতজ্ঞ হতে চায়।”^{৬৩}

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবিয়ী হাসান বাসরী^{৬৪} রহিমাহুল্লাহ বলেন, যে-ব্যক্তি রাতে ইবাদাত-বন্দেগির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারল না, তার জন্য দিনে সন্তুষ্টি কামনা করার সুযোগ রয়েছে। আর যে-ব্যক্তি দিনে পারল না, তার জন্য রাতে সন্তুষ্টি কামনা করার সুযোগ রয়েছে। বান্দা ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যে থাকে—যতক্ষণ সে যা বলে আল্লাহর জন্য বলে এবং যত কাজ করে, সব আল্লাহর জন্যই করে।^{৬৫}

তবে সালাফদের জীবনযাপন এমন ছিল যে, তারা রাত জেগে তো ইবাদাত করতেনই, সেই সাথে দিনের সুযোগকেও কাজে লাগাতেন। যেমন, মুওয়াররিক আল-ইজলী^{৬৬} রহিমাহুল্লাহ। তিনি ছিলেন অনেক বড়ো একজন ব্যবসায়ী। তবে তার ব্যবসা আর পাঁচজন দুনিয়াদার ব্যবসায়ীর মতো ছিল না। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন রাত জেগে ইবাদাতকারী, অন্যদিকে দিনের ব্যবসায়িক ব্যস্ততাকেও তিনি পরিণত করেছিলেন ইবাদাতে।^{৬৭} কাতাদাহ রহিমাহুল্লাহর সূত্রে আমরা জানতে পারি, তার কাছে যখনই ব্যবসার মুনাফা জমা হতো, তিনি তা ফকির-মিসকিনদের মাঝে দান করে দিতেন। এত বেশি দান করার ব্যাপারে কেউ তাকে প্রশ্ন করলে তিনি হাসিমুখে উত্তর দিতেন, ‘যদি এই দরিদ্র লোকেরা না থাকত, তবে আমি ব্যবসাই করতাম না’।^{৬৮}

আল্লাহু আকবার! কত ভারী কথা! অর্থাৎ, তার ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যই ছিল গরিব-মিসকিনদের সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দুনিয়া কামানো নয়। আর এভাবেই তিনি তার জাগতিক ব্যস্ততাকেও রূপান্তর

[৬৩] সূরা ফুরকান : ৬২

[৬৪] মৃত্যু : ১১০ হিজরি।

[৬৫] ইমাম সা’লাবী, আল-কাশফ ওয়াল বায়ান আন তাফসিরিল কুরআন : ৭/১৪৪।

[৬৬] মৃত্যু : ১০৫ হিজরি।

[৬৭] ইমাম মিশযী, তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ২৯/১৬-১৭।

[৬৮] ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ : ১/২৫৪।



পাতে না; আর এ-কারণে আমরা মনে করে থাকি তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল— এমন মানুষগুলোকেই প্রকৃত অভাবী বলা হয়েছে। তারাও সাহায্য পাওয়ার হকদার। বরং ক্ষেত্রবিশেষে অধিক হকদার। কারণ, অনেকেই তাদেরকে সচ্ছল মনে করে দান করা থেকে বিরত থাকে। এজন্যই মুওয়াররিক আল-ইজলী রহিমাহুল্লাহ সমাজের এই শ্রেণির মানুষদেরকে বিশেষভাবে দান করতেন। আর সেটা এমন পদ্ধতিতে করতেন, যাতে তাদের আত্মসম্মানবোধ ক্ষুণ্ণ না হয়।

তার সেই বিশেষ পদ্ধতিটি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন জাফর ইবনু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, “মুওয়াররিক আল-ইজলী রহিমাহুল্লাহ ব্যবসা করে প্রচুর অর্থসম্পদ উপার্জন করতেন—এটা অনেকেরই জানা। কিন্তু এমন কোনো শুক্রবার আসত না, যেদিন তার কাছে সেসব অর্থসম্পদের কিছু বাকি থাকত। দেখা হওয়া মাত্রই তিনি তার দ্বীনি ভাইদের মধ্যে যাদের প্রয়োজন আছে কিন্তু অন্যের দানের মুখাপেক্ষী হয় না—এমন ভাইদের কাউকে তিনশ’, চারশ’, কাউকে পাঁচশ’ দিরহাম পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। অতঃপর তাদেরকে বলতেন, তোমাদের প্রয়োজনে খরচ করার জন্য এগুলো রাখো। আমার প্রয়োজন হলে ফেরত নেব। পরে যখন তাদের সাথে দেখা হতো, তারা সেই অর্থগুলো ফেরত দিতে চাইলে তিনি বলতেন, ওটা রেখে দাও, আমি তো বলেছিলাম আমার প্রয়োজন হলে ফেরত নেব, কিন্তু এখন আমার এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। কাউকে বলতেন, ওয়াল্লাহি! আমি এগুলো কখনোই গ্রহণ করছি না। অতএব, এগুলো আপনারই।”^{৭১}

আমাদের আজকের যুগেও দ্বীনি কমিউনিটিতে বড়ো ব্যবসায়ীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। তারা অনেকেই হয়তো বাৎসরিক যাকাতের বাইরেও বিভিন্ন দান-সদাকা করে থাকেন। কিন্তু নিয়ম করে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে প্রকৃত অভাবীদের সচ্ছল করার এমন উদ্যোগ দেখা যায় না। কিন্তু মুওয়াররিক রহিমাহুল্লাহ এই কাজটিই করতেন। তিনশ’ থেকে পাঁচশ’ দিরহামের বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৯০ ডলার থেকে ১৬০ ডলারের মতো। টাকার মূল্যে যার পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার টাকা থেকে ১৮ হাজার টাকা পর্যন্ত।^{৭২} এমন না যে, কেবল তিনজনকেই

[৭১] ইবনু সা’দ, আত-তবাকাতুল কুবরা: ৭/১৬১।

[৭২] বলাবাহুল্য যে, কারেন্সি কনভারশনের এই হিসেব সময়ের সাথে সাথে কমতে-বাড়তে



এ-বিষয়ে প্রখ্যাত তাবিয়ী উসমান ইবনু আবি দাহরাশ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ আমাদের জন্য একটি ছোট স্মরণিকা বর্ণনা করেছেন। উসমান রহিমাহুল্লাহ যখন ফজরের ওয়াক্তে উপনীত হতেন, তখন খুব আফসোস করতেন। কারণ, জীবন থেকে আরও একটি দিন চলে গেল। তিনি বলতেন, ‘আমি এখন লোকজনের সাথে আছি। কিন্তু (যখন আমি একাকী আখিরাতের জীবনে পদার্পণ করব) আমি তো জানি না, সেই সময়ের উপযোগী করে নিজের জন্য আমি কী অর্জন করলাম।’^{১৪৬}

সালাফদের সাথে আমাদের চিন্তাজগতের মূল পার্থক্যটাই এখানে। আমরা যখন লোকজনের সাথে থাকি—বিশেষ করে কাছের মানুষদের সাথে—তখন আমরা খুব কমই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাতাআলাকে স্মরণ করে থাকি। আখিরাতের প্রস্তুতির কথা, জাহান্নামের আজাবের কথা কিংবা সেই আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা কতটুকুই স্মরণ করি আমরা?

উসমান ইবনু আবি দাহরাশ রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি প্রত্যেক সলাতের পরেই আল্লাহর কাছে ওই সলাতের মধ্যে হয়ে যাওয়া অপূর্ণতার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।^{১৪৭}

হাসান বাসরী রহিমাহুল্লাহ একবার বাজারে গেলেন কিছু কেনাকাটা করতে। এ-যুগে যেমন মফস্বল বা শহরতলীর বড়ো বাজারগুলোতে মালামাল বহন করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া বা গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য কুলি থাকে, তখনকার সময়ও বাজারে এমন কিছু লোক পাওয়া যেত। তাদের পিঠে দড়িতে বাঁধা একটি ঝুড়ি থাকত। সে-ঝুড়িতে করে তারা ক্রেতাদের মালামাল বহন করে বাড়িতে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিত। এমনই এক ১০ বছর বয়সি বালককে হাসান বাসরী দেখতে পেলেন পিঠে ঝুড়ি নিয়ে কুলির কাজ করছে। তিনি বালকটিকে ভাড়া করলেন তার মালামাল বহনের জন্য।

বালক নিজের ঝুড়িতে তার জিনিসপত্রগুলো ভরে নিয়ে তার সাথে হাঁটা শুরু করল। হাসান রহিমাহুল্লাহ খেয়াল করলেন, বাজার থেকে বাড়িতে

[১৪৬] ইবনুল জাওয়ী, আল-মুস্তাযাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম : ৭/২২৪।

[১৪৭] প্রাপ্ত।



একজন বুঝতে পারল। সে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল—‘হে আবু বকর, এই সময়েও?’ অর্থাৎ, বাজারে এসেও আপনি ইবাদাত করছেন?

তিনি উত্তর দিলেন, ‘এটা তো গাফিলতির সময়।’ অর্থাৎ, বাজারে ঘোরাফেরার সময়টা তো গাফিলতির সময়, তাই আমি একে আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কাজে লাগাচ্ছি।^{১৫০}

এমনটাই ছিল আমাদের সালাফদের নিকট সময়ের গুরুত্ব। তারা সলাতে কিংবা অবসর-উদাসীনতায় সর্বদাই নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখতেন ইস্তিগফার ও আল্লাহর স্মরণে। এ-যেন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ। আগের-পরের সকল ত্রুটি থেকে যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন^{১৫১}, সেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দৈনিক একশতবার ইস্তিগফার পড়তেন!^{১৫২}

‘আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তিগফার পড়লে আমরা আমরা তা গণনা করতাম। দেখতে পেতাম তিনি এক মজলিসে একশতবার পর্যন্ত ইস্তিগফার পড়তেন। তিনি পাঠ করতেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

“হে রব, আপনি আমকে ক্ষমা করুন। আমার তাওবাহ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবাহ কবুলকারী ও দয়াময়।।”^{১৫৩}

[১৫০] আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/২৭২; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ : ১/২৩৯।

[১৫১] সূরা ফাতহ : ০২

[১৫২] সহিহ মুসলিম : ২৭০২; সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৫, মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩৯১, ১৭৮২৭; সুনানুদ দারিমী : ২৬৪০।

[১৫৩] সুনানু আবি দাউদ : ১৫১৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৮১৪; মুসনাদু আহমাদ : ৪৭২৬, সহিহ ইবনি হিব্বান : ৯২৭; তবে ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় বাক্যের শেষে ‘التَّوَّابُ الرَّحِيمُ’ অর্থাৎ ‘তাওবাহ কবুলকারী ও দয়াময়’ শব্দদ্বয়ের জায়গায় এসেছে ‘التَّوَّابُ الْغَفُورُ’ ‘তাওবাহ কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।’—সুনানুত তিরমিযী : ৩৪৩৪।



অর্জনকারীই হচ্ছে প্রকৃত মুত্তাকি।”^{২০৫}

আরেকজন তাকে যিকির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, “যিকির হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাতাআলার আনুগত্য! সুতরাং যে-ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মেনে তাঁর আনুগত্য করল সে-ই আল্লাহর প্রকৃত যিকিরকারী। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম মান্য করা থেকে বিমুখ হলো; অর্থাৎ, তার আনুগত্য করল না, সে যদি সারা রাত তাসবিহ জপে আর তিলাওয়াত করে কাটায় তবুও সে যিকিরকারী নয়!”^{২০৬,২০৭}

মতামত প্রদানে সালাফদের আদর্শ

প্রখ্যাত তাবিয়ি ইমাম আমির ইবনু শুরাহবিল আশ-শা’বী রহিমাহুল্লাহ ছিলেন তার সময়কার একজন বিখ্যাত ফকিহ। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরভিত কানন সাহাবায়ে কেরামের সাহচর্যধন্য যেসকল তাবিয়ি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেদেরকে আদর্শের আসনে নিয়ে গেছেন, তিনি তাদেরই একজন। তাকওয়া ও ইখলাসের সহিত ইলমচর্চার মাধ্যমে তিনি এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন যে, তাকে সে-যুগের আলিমদের মাঝে শ্রেষ্ঠ চারজনের একজন গণ্য করা হতো।

ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “সমসাময়িক আলিম চারজন। মদিনার সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, কুফার আমির ইবনু শুরাহবিল আশ-শা’বী, বসরার হাসান আল-বাসরী, আর সিরিয়ার মাকহুল আশ-শামী।”^{২০৮}

এত বড়ো ও সম্মানিত আলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিনয়ের কারণে নিজেকে

[২০৫] ইমাম যাহাবী, সিয়রু আলামিন নুবালা : ৪/৩২৬।

[২০৬] ইমাম মিশযী, তাহযিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ১০/৩৬৫।

[২০৭] উল্লিখিত উৎসগ্রন্থদ্বয়ে মূলত সংজ্ঞাদুটি একই উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কারও প্রশ্নের উত্তরে আলাদা আলাদাভাবে এর উল্লেখ দেখতে পাই, শাইখ ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশার গ্রন্থে দেখুন—সুওয়ারুম মিন হায়াতিত-তাবিয়িন : ১/২১৩।

[২০৮] ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম : ৭/২৮০।

তিনি বললেন, “মৃত্যুর ভয় বা যন্ত্রণায় আমি কাঁদছি না, দুনিয়ার প্রেমেও আমি কাঁদছি না; আমি কাঁদছি কেবল দ্বিপ্রহরের তৃষ্ণা (অর্থাৎ সিয়ামরত অবস্থার পিপাসা) এবং শীতকালে (রাত জেগে) সলাতের কথা স্মরণ করে।^{২৪৪}

সিয়াম রেখে দিনের বেলায় যে কষ্ট অনুভব হয়, একজন মুমিন তা সহ্য করে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়। একইভাবে রাতের কিয়ামও কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ নফল ইবাদাতগুলো তাদের নিকট এতটাই প্রিয় ছিল যে, তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আখিরাতের পথে যাত্রাকালেও এগুলোর জন্য আফসোস করেছেন। হায়! এ প্রিয় ইবাদাতগুলো তো আর করতে পারব না। কিংবা, হায়! যদি আরও বেশি ও সুন্দর করে ইবাদাতগুলো করতাম।

এবার একটু আমাদের দিকে তাকাই; ইবাদাতের জন্য এত উর্বর এক মৌসুম শীতকালকে আমরা কীভাবে উদ্যাপন করি? কোথায় দিনের সিয়াম? কোথায় রাতের কিয়াম? আমাদের অনেকের অবস্থা তো এমন দাঁড়ায় যে, উষ্ণ বিছানা ছেড়ে ফজরের নামাজের জন্য উঠতেও কষ্ট হয়ে যায়! অথচ শীতকালে বিভিন্ন মৌসুমী খাবার খাওয়ার জন্য দলবেঁধে ঠিকই আমরা রাত জাগতে পারি।

অথচ, ব্যাপারটা হওয়া উচিত ছিল সালাফদের মতো হুবহু না হলেও শীতকালীন বরকতময় সময়ে অন্তত কিছুটা বাড়তি ইবাদাত করা। সারাবছর নফল সিয়াম না রাখা হলেও, এ-সময়ে কিছু নফল সিয়াম রাখা। সারাবছর ঘুম পুরো না হওয়ার অজুহাতে তাহাজ্জুদের জন্য না জাগলেও, এ-সময় উচিত ছিল মাঝে মাঝে শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদে দাঁড়ানো, যেহেতু এর রাত দীর্ঘ।

[২৪৪] ইমাম ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ ওয়ার রকাইক : ১/৯৫; ইবনু আবিদ দুনইয়া, আল-মুহতাদারিন : ১/১৪০।